ইউনিট ২: শিক্ষার দার্শনিক ভিত্তি

ভূমিকা

দর্শন সম্পর্কে ইতিপূর্বের আলোচনায় আমরা দেখেছি যে, দর্শন সত্যানুসন্ধান করে। দার্শনিক মাত্রই জ্ঞানানুরাগী বা সত্যের সন্ধানী। জগত ও জীবনের মৌলিক প্রশ্নেসমূহের যৌক্তিক উত্তর অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণকে সংক্ষেপে দর্শন বলা যায়। দর্শন জীবন ও জগতকে দেখে এক অখণ্ড দৃষ্টিতে। তাই দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গি হলো সার্বিক বা সর্বজনীন। আর শিক্ষা দর্শন শিক্ষার যে তাত্ত্বিক দিক, মূল্য বা মানদণ্ড ও আদর্শয়ানের দিক তা নির্ধারণ করে থাকে। কাজেই শিক্ষা দর্শনের সাথে দর্শনের যোগসূত্র যে ঘনিষ্ঠ তা সহজেই অনুমান করা যায়। বর্তমান ইউনিটের লক্ষ্য শিক্ষা দর্শনের স্বরূপ, কাজ ও শিক্ষাদানের নানা পদ্ধতির সাথে দর্শনের পদ্ধতির সম্পর্ক ও শিক্ষা দর্শনের ঐতিহাসিক বিবর্তন সম্পর্কে ধারাবাহিক আলোচনা করা। আলোচনার সুবিধার্থে ইউনিটটিকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

পাঠ ১: শিক্ষা দর্শনের স্বরূপ

পাঠ ২: দর্শনের কাজ

পাঠ ৩: দর্শনের সাথে শিক্ষা দর্শনের সম্পর্ক

পাঠ ৪: দর্শন ও শিক্ষাদানের পদ্ধতি

পাঠ ৫: শিক্ষা দর্শনের তিন যুগ

পাঠ- ২.১: শিক্ষা দর্শনের স্বরূপ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- দর্শন কী তা বলতে পারবেন।
- শিক্ষা দর্শনের স্বরূপ নির্ণয় করতে পারবেন।
- শিক্ষা দর্শনের কাজগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।
- শিক্ষার সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করতে পারবেন।
- শিক্ষা দর্শনের কাজ কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

শিক্ষা দর্শনের স্বরূপ

দর্শনের প্রকৃতি ও পরিচয় আমরা ইতিপূর্বে পেয়েছি তাতে দর্শন যে জীবন ঘনিষ্ঠ একটি বিষয়, জীবন বিচ্ছিন্ন নয় তা আমরা উপলব্ধি করতে পেরেছি। কী ব্যক্তি জীবন, কী সমাজ জীবন উভয় জীবনেরই একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য রয়েছে যা তার মূল্যবোধ, বিশ্বাস ও আদর্শ দ্বারা চালিত হয়। দর্শন এ বিষয়গুলোর প্রত্যেকটিকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করে দেখায় তাই নয় কোনটি জীবনের জন্য শ্রেয় ও কল্যাণকর অথবা কোনটি ভাল বা মন্দ কিংবা উচিত বা অনুচিত এসব নির্দেশনা দেয়া যেমন দর্শনের কাজ এবং তা বাস্তবায়নের পথও দেখায় দর্শন। আর দর্শনের সে কাজটি করার জন্যই উপায় বা মাধ্যম হচ্ছে শিক্ষা। শিক্ষা ব্যতীত মূল্যবোধ গঠন ও বাস্তবায়ন কোনটিই সম্ভব নয়। শিক্ষার কাজই হলো সুপ্ত প্রতিভা ও গুণাগুণকে বিকশিত ও বাস্তবায়িত করা, অস্পষ্টকে পরিস্ফুটিত করে তোলা। অকল্যাণের পরিবর্তে কল্যাণকে প্রতিষ্ঠা করা। এ কারণেই স্যার জন এডমাস বলেন, শিক্ষা হল দর্শনের গতিময় দিক। বলা যায় শিক্ষার আদর্শ নির্ণয়ের তাত্ত্বিক দিক হল দর্শন আর দার্শনিক বিশ্বাসের বিধৃত করার ব্যবহারিক উপায় হল শিক্ষা। কাজেই শিক্ষা ও দর্শন এক অপরের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। এ জন্যই প্রকৃত দার্শনিক মাত্রই, প্রকৃত শিক্ষক। কেননা সত্য বা জ্ঞান অন্বেষণ করেন দার্শনিক। আর এ জ্ঞানান্বেষণকেই প্রকৃত শিক্ষা বলা যায়।

দার্শনিক মাত্রই শিক্ষাবিদ না হয়ে পারেন না। কেননা জীবন জগতের যে মৌলিক প্রশ্নগুলোর যৌক্তিক ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা দার্শনিকরা করেন তার লক্ষ্য হলো পৃথিবীতে মানুষের জন্য সুষ্ঠু ও সুন্দর জীবন যাপনের পরিবেশ তৈরি করে দেয়া। যেমন, আমি কে? কোথা থেকে এলাম? আমার দায়িত্ব বা করণীয় কী? এসব প্রশ্ন উত্থাপন ও তাদের উত্তর দান করা মানব জীবনের জন্য খুবই জরুরি। কাজেই দর্শন মানুষকে যে আদর্শের দিকে পথ নির্দেশ করে তা বাস্তবায়নের কাজটি করে শিক্ষা। শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য শুধু সুপ্ত গুণাবলির পূর্ণ বিকাশ ঘটানো তা নয়, সেই সাথে ব্যক্তিকে প্রভাবিত ও প্ররোচিত করা একটি আদর্শিক সমাজ গঠনের দিকে। অর্থাৎ শিক্ষার কাজ লক্ষ্য অভিমুখী তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই লক্ষ্যটি কী হওয়া উচিত সেই তাত্ত্বিক দিকটি উন্মোচন করে দেয় দর্শন। তাই দর্শন হচ্ছে শিক্ষার উৎস ও ভিত্তি ভূমি। শিক্ষা যা থেকে তার প্রয়োজনীয় উপায় ও উপকরণ সংগ্রহ করে মানুষকে সঠিক দিক নির্দেশনা দেয় যাতে শিক্ষার্থী জীবনে পরম কল্যাণ অর্জনে সক্ষম হয়। আর পরম কল্যাণের ধারণা সরবরাহ করে দর্শন ও দার্শনিক।

দর্শন কেবল তত্ত্ব সরবরাহ করে তা নয়, পদ্ধতিগত দিক থেকে বিচার করলে দর্শন একটি দৃষ্টিভঙ্গি। দর্শন এমন কিছু পদ্ধতির কথা বলে যা কেবল দার্শনিক সমস্যা চিহ্নিতকরণে ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণেই ভূমিকা রাখে তা নয়, এ

পদ্ধতিগুলোকে শিক্ষা-শিখন কার্যক্রম পরিচালনায় সক্রিয় ভূমিকা রাখতে সক্ষম। কেননা দর্শন এক সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে সর্বজনীন সমস্যাগুলোর সমাধানের প্রয়াস পায়। আর তাই শিক্ষা কার্যক্রম ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে যে সমস্যার সম্মুখীন হোক না কেন সেক্ষেত্রে দার্শনিক পদ্ধতিগুলোকে কাজে লাগিয়ে অনায়াসেই শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করতে পারে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, শিক্ষা প্রক্রিয়া বা শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রমকে কেবল তাত্ত্বিকতার দিক দিয়েই দর্শনের শরণাপন্ন হতে হচ্ছে তা নয়; বরং পুরো প্রক্রিয়াটিকে বাস্তবায়নের জন্য যে পদ্ধতিগুলো প্রয়োগ করা প্রয়োজন সে দিক দিয়েও দর্শনের উপরেই নির্ভরশীল। দর্শনকে বাদ দিয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু সফল বাস্তবায়ন কখনোই সম্ভব নয়।

সুতরাং শিক্ষা দর্শন বলতে যে বিষয়টিকে বুঝায় তা দর্শন ও শিক্ষার একটি সুসামঞ্জস্যপূর্ণ যৌক্তিক সমন্বয় যাকে বলা যায় শিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় দার্শনিক তত্ত্ব ও মতবাদ সরবরাহ করাসহ যাবতীয় সমস্যায় দার্শনিক পদ্ধতির প্রয়োগ, শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ণয় এবং উপযুক্ত শিক্ষার পরিবেশ তৈরি ও প্রয়োজন অনুযায়ী নবতর শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন ও বিনির্মাণ করা।

শিক্ষা দর্শনের কাজ

শিক্ষা দর্শনের যে প্রকৃতি ও স্বরূপ আমরা নির্ণয় করেছি তা থেকে শিক্ষা দর্শনের কাজকে পর্যায়ক্রমে নিচে বর্ণনা করা হলো।

১. অনুধ্যানমূলক কাজ;
২. সমন্বয়মূল কাজ;
৩. বিচারমূলক কাজ;
৪. আদর্শায়নমূলক কাজ;
৫. মূল্যায়নমূলক কাজ;
৬. নির্দেশনামূলক কাজ;
৭. সংগঠনমূলক কাজ;
৮. ব্যক্তিক দৃষ্টিতে সর্বজনীন দৃষ্টিতে রূপায়িত করার কাজ।

১. **অনুধ্যান বা চিন্তামূলক কাজঃ** শিক্ষা দর্শনের প্রথম ও প্রধান কাজটিই হলো অনুধ্যানমূলক। দর্শন স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে শেখায়। মানুষ মাত্রই চিন্তাশীল সত্তা। জ্ঞানের সকল শাখাতেই এই চিন্তার বহি:প্রকাশ ঘটছে। ইতিহাস, বিজ্ঞান, সামাজিক বিজ্ঞান, ভূগোল, পরিবেশ বিদ্যা প্রভৃতি বিষয় থেকে চিন্তার মূল উপাদান সংগ্রহ করে থাকে শিক্ষা দর্শন। অতপর সে সব তথ্য উপাত্তকে আরো সুবিন্যাস চিন্তার মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে শিক্ষার রূপরেখা দাঁড় করায়। শিক্ষার ইতিহাস থেকেও দেখা যায় শিক্ষার রূপরেখা ও উপায় উপকরণ বা পদ্ধতি সব সময় এক রকম ছিল না। প্রাচীন কালের শিক্ষা মধ্যযুগীয় শিক্ষা থেকে যেমন আলাদা তেমনি আধুনিক কালের শিক্ষাও মধ্যযুগ ও প্রাচীন যুগ থেকে আলাদা। কিন্তু এ বিভিন্নতার মাঝেও একটা ঐক্য ও সেতু তৈরি করে চিন্তন প্রক্রিয়ায় শিক্ষাবিদগণ একটা গ্রহণযোগ্য শিক্ষা ব্যবস্থার রূপরেখা প্রদানের প্রয়াস পান। এটা শিক্ষা দর্শনের চিন্তন ও অনুধ্যানমূলক কাজ যা সর্বপ্রথম শিক্ষা দার্শনিকগণ করে থাকেন।

২. **সমন্বয়মূলক কাজঃ** শিক্ষা দর্শনের চিন্তনমূলক কাজগুলোর মধ্যে সমন্বয়মূলক কাজও অন্যতম। শিক্ষা দর্শনের এ সমন্বয়ের ফলাফল কখনও একই ধারায়, কখনো বা দুই ধারায় আবার কখনো বহু ধারায় প্রকাশিত হয়। যেমন, ফ্যাসীবাদী শিক্ষা দর্শন এক ধারার দর্শন কিছু দ্বিধারার শিক্ষা দর্শনে ধর্মীয়ভাব বজায় থাকাতে সেখানে আধ্যাত্মিকতা ও জাগতিকতা দুটোই সমান গুরুত্ব পায়। অন্যদিকে গণতান্ত্রিক শিক্ষা দর্শনে বহুধারার শিক্ষা দর্শন। কেননা তাতে বিভিন্নমুখী সংস্কৃতির চর্চা ও উন্নয়নকে মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়। আর সে

কারণেই শিক্ষা দর্শনের কাজ হলো এই বিভিন্নতার মাঝেও কীভাবে সমন্বয় সাধন করে একটা সর্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন ও প্রতিষ্ঠা করা যায়।

৩. **দিক নির্দেশনামূলক কাজঃ** বিভিন্নমুখী শিক্ষা ধারার মাঝেও সকল বিভিন্নতাকে ঐক্যের মাঝে আনা এবং বিভিন্নমুখী সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চাহিদার মাঝে একটা সাধারণ ধারা খুঁজে বের করে আনা যায় যাতে বিভিন্ন দল উপদলের মাঝে বিদ্যমান দ্বন্দ্ব ও সংঘাত কমে আসে এমন একটি পথের নির্দেশনাই দিয়ে থাকে। প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলিত শিক্ষানীতিও অনেক সময় সমস্যার সম্মুখীন হয়। বর্তমান প্রয়োজন ও পরিস্থিতির প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে তখন যুগোপযোগী একটি পরিমার্জিত শিক্ষানীতি দাঁড় করানোর কাজ অর্থাৎ সঠিক দিক নির্দেশনা দিতে পারে শিক্ষা দর্শন।

৪. **বিচারমূলক কাজঃ** শিক্ষা দর্শনের অন্যতম প্রধান একটি কাজ হলো শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়াবলীতে ব্যবহৃত যাবতীয় শব্দ ও অবধারণের পরীক্ষা নিরীক্ষা ও বিচার বিশ্লেষণ করা। আর কাজটি করতে গিয়ে কেবল বিষয়গত যথার্যতা নয়, আকার গত যথার্থতা (Validity) সম্বন্ধেও পুঙ্খনাপুঙ্খরূপে বিচার করে থাকে শিক্ষা দর্শন। বিশেষ করে যে তিনটি বিষয়ে লক্ষ্য করে তাহলো প্রথমত শিক্ষা সংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুলোর যথার্থতা যাচাই করা, দ্বিতীয়ত, ব্যবহৃত ভাষাটিকে পরীক্ষা করে তার অর্থের স্পষ্টতা ও দ্ব্যর্থহীনতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া; তৃতীয়ত শিক্ষা সংক্রান্ত বিবৃতিসমূহের সমর্থনের অথবা খণ্ডনের জন্য যে সমস্ত তথ্য প্রমাণ গৃহীত হয় সেগুলোর অন্তর্নিহিত অর্থ উপলব্ধির চেষ্টা করা।

৫. **আদর্শায়নমূলক কাজঃ** দর্শনের অন্যতম শাখা মূল্যবিদ্যা যা মূল্য নির্ণয়ের কাজ করে থাকে। আর শিক্ষা অর্থই হচ্ছে মানসম্পন্ন শিক্ষা যা ব্যক্তি ও সমাজের কল্যাণ সাধন করে। যে অভিজ্ঞতা বা বিদ্যা মানব কল্যাণে কাজ করে না তা শিক্ষা নয়। প্রকৃত শিক্ষা সব সময় গুণ বা মান সম্পন্ন। যার মাঝে একটি বা একাধিক উদ্দেশ্য নিহিত থাকে। মূল্যবোধ বিশেষ করে ব্যক্তির নৈতিক মূল্যবোধ, ধর্মীয় মূল্যবোধ ও সামাজিক মূল্যবোধ, নান্দনিক মূল্য এসব কিছুকে সংরক্ষণ ও প্রতিপালনযোগ্য করেই শিক্ষানীতি তৈরি হয়। আর সব ধরনের মূল্যের ধারক ও বাহক হলো শিক্ষা। শিক্ষার মাধ্যমে তা ব্যক্তি ও সমাজে পরিস্ফুটিত করা শিক্ষা দর্শনের কাজ। শিক্ষা দর্শন সেটি করতে গিয়ে একদিকে প্রচলিত মূল্যবোধের যৌক্তিকতা ও যথার্থতা যাচাই করে এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কী করণীয় বা কী হওয়া উচিত সে দিক নির্দেশনাও দেয়।

৬. **মূল্যায়নমূলক কাজঃ** শিক্ষা দর্শন শিক্ষাকে আদর্শ মান সম্পন্ন করার যে কাজটি করে থাকে তা করতে গিয়ে মূল্য বা আর্দশের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও যৌক্তিকতা যাচাই করে দেখে কোনটি অধিক কল্যাণকর। আর সে কাজটি পরম মূল্য বা পরম আদর্শের মানদণ্ডেই করে থাকে। একটা পরম আদর্শকে সামনে রেখেই দর্শন তথা শিক্ষা দর্শনও জীবন জগতের মূল্যাবধারণ করে। দর্শনের উৎপত্তিই হয়েছে মানব জীবন ও তার প্রয়োজন থেকে; কোন আকাশকুসুম স্বপ্ন থেকে নয়। দার্শনিক পেরী তাই বলেন, "দর্শন আকস্মিকও নয়, অলৌকিক নয়, বরং এ হলো অনিবার্য ও স্বাভাবিক"। কাজেই জীবন ও অভিজ্ঞতার সমালোচনা করে দর্শন আদর্শ ও মূল্যাবধারণ করে সমগ্র মানব জাতির কল্যাণের জন্য। শিক্ষা দর্শন কল্যাণের এই সাধারণ ও সর্বজনীন রূপটিকে বাস্তবায়নের কাজ করে শিক্ষার মাধ্যমে। বিশ্বজনীনতা ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠাও শিক্ষা দর্শনেরই কাজ।

৭. **সংগঠনমূলক কাজঃ** অনুধ্যানমূলক ও বিচারমূলক কাজ করেই শিক্ষা দর্শন থেমে যায় না। শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়াদির চুলচেরা বিচার বিশ্লেষণের পর যে কোন সমস্যা সমাধানে একটা সামগ্রিক বা সংগঠনমূলক পথের সন্ধান দেয় শিক্ষা দর্শন যাতে করে প্রচলিত বিধি-বিধান, রীতি-নীতির সাথে সংঘাত ও দ্বন্দ্ব মিটিয়ে বর্তমান প্রজন্মের জন্য নতুন কিছু করা যায়। আর সে জন্য বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সকল দিকের বিচার-বিশ্লেষণের পর সবসময় সংগঠনমূলক দৃষ্টিতে এক সমাধানের পথ নির্দেশনা দেয় শিক্ষা দর্শন।

৮. **ব্যক্তিক দৃষ্টিকে সর্বজনীন দৃষ্টিতে রূপায়িত করার কাজঃ** এটি শিক্ষা দর্শনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মধ্যেই নিহিত থাকে যে, একটা জাতির জন্য বা গোষ্ঠীর জন্য নয়, শিক্ষাকে ঢেলে সাজাতে হবে বিশ্বজনীন দৃষ্টিতে। বর্তমান বিশ্বে ব্যক্তি কেবল রাষ্ট্র বা সমাজের সদস্য তা নয় বরং বিশ্ব সমাজের সদস্য হিসেবে তার মন মানসিকতা

গড়ে তোলার কাজটি করে শিক্ষা দর্শন। আজ জাতিতে জাতিতে হানাহানি, যুদ্ধ বিগ্রহ ও মরণাস্ত্র তৈরির মত যে কাজগুলো সংঘটিত হয়ে চলেছে তাতে মানবতার কল্যাণ কতটুকু বিদ্যমান আছে তা ভাবার বিষয় এবং এ সমস্যা থেকে উত্তরণের উপায় সন্ধান করা জরুরি হয়ে পড়েছে। বিজ্ঞান মানবতার কল্যাণে ব্যবহৃত হবে, নাকি মানবতার ধ্বংসের জন্য তা তলিয়ে দেখা দরকার। কিন্তু এসব সমস্যার সমাধান তখনই সম্ভব যখন ব্যক্তির দৃষ্টিকে সর্বজনীন দৃষ্টিতে রূপায়িত করা যাবে। জাগিয়ে তুলতে হবে মানুষের অন্তর আত্মার মাঝে সর্বজনীন প্রেম। তা কেবল সুষ্ঠু শিক্ষা সুষ্ঠু জীবন দান করতে পারে। আর যথার্থ শিক্ষানীতির মাধ্যমে যাতে বিশ্বজনীন সমাজ গঠন ও বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠা পায় তার জন্য যে কাজটি তা শিক্ষা দর্শনই করে থাকে। শিক্ষা দর্শনই পারে ব্যক্তিক দৃষ্টিকে সর্বজনীন দৃষ্টিতে রূপান্তরিত করতে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.১

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. ইংরেজি 'Philosophy' শব্দটির কোন দুইটি শব্দ থেকে?
   ক. Philos ও Sophia
   খ. Philos ও Phycho
   গ. Philos ও Knowledge
   ঘ. Philos ও Vartue

২. দর্শনের সমস্ত আলোচ্য বিষয়কে কয়টি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়?
   ক. নয়টি
   খ. দশটি
   গ. সাতটি
   ঘ. পাঁচটি

৩. শিক্ষা শব্দটির উৎপত্তি কোন সংস্কৃত শব্দ থেকে?
   ক. শাস
   খ. শ্বাস
   গ. সামাৎ
   ঘ. সাস

৪. শিক্ষা দর্শন বলতে কোন বিষয়টিকে বুঝায়?
   ক. দর্শন ও শিক্ষার সুসামঞ্জস্যপূর্ণ যৌক্তিক সমন্বয়কে
   খ. শিক্ষা ও দর্শনের আংশিক সমন্বয়কে
   গ. শিক্ষা ও দর্শনের পরস্পর নির্ভরশীলতাকে
   ঘ. শিক্ষা ও মনোদর্শনকে

উত্তরমালা: ১. ক, ২. খ, ৩, ক, ৪. ক

খ. সংক্ষিপ্তমূলক প্রশ্ন

১. দর্শনের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করুন।
২. শিক্ষা দর্শন বলতে কী বুঝায়?
৩. শিক্ষা দর্শনের প্রধান কাজ কী?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. দর্শনের অর্থ ও প্রকৃতি নির্ণয় করুন।
২. শিক্ষা বলতে কী বুঝায়? শিক্ষার প্রকৃত তাৎপর্য ও বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।
৩. শিক্ষা দর্শনের স্বরূপ ব্যাখ্যা করুন। দর্শনের সাথে শিক্ষা দর্শনের সম্পর্ক নির্ণয় করুন।
৪. শিক্ষা দর্শনের কাজগুলো বর্ণনা করুন।

পাঠ- ২.২: দর্শনের কাজ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- দর্শনের কাজ কী তা বলতে পারবেন।
- দর্শনের অনুধ্যানমূলক কাজ কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- দর্শনের বিচারমূলক কাজ কী তা বলতে পারবেন।
- দর্শনের গঠনমূলক কাজ সম্পর্কে বলতে পারবেন।

দর্শনের বিষয়বস্তু

দর্শনের বিষয়বস্তু ও স্বরূপ সম্পর্কে আমরা এ পর্যন্ত যে ধারণা পেলাম তা থেকে সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন আসে যে, দর্শনের কাজ আসলে কী। দর্শনের গুরুত্ব ও তাৎপর্যকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করার জন্যেও দর্শনের কাজ কী তা নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন বলে মনে করছি। দর্শনের কাজকে আমরা আলোচনার সুবিধার্থে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করতে পারি। যথা–

১. অনুধ্যানমূলক কাজ (Speculative Function);
২. বিচারমূলক কাজ (Critical Function); এবং
৩. গঠনমূলক কাজ (Constructive Function)।

দর্শনের অনুধ্যানমূলক কাজ

মানুষ বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন প্রাণী তাই সে চিন্তা না করে পারে না। বিশ্ব জগতের তথা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের যাবতীয় বিষয়ই তাকে ভাবিয়ে তুলে। তার মনে জাগে অসংখ্য প্রশ্ন, যেমন– এ বৈচিত্র্যের জগতকে সৃষ্টি করলেন, সে কোথায় থাকে? মানুষ কোথা থেকে এসেছে, কোথায় বা তার শেষ? আমাদের চারিপাশে যা দেখছি সেটা কী সত্যি নাকি মিথ্যা? মৃত্যু কী? মৃত্যুর পরের কোন জীবন আছে কী? জড় কী? জড়ের সাথে জীবের সম্পর্ক কী? আত্মা কী? দেহের সাথে আত্মা বা মনের সম্পর্ক কী? আত্মা কী অমর? জ্ঞান কী? জ্ঞানের বিষয়বস্তু কী? ঈশ্বর কী? জগতের সাথে তার সম্পর্ক কী? ইত্যাদি। মানুষের কৌতূহলি মন এ জাতীয় নানা প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করছে প্রতি মূহুর্তে। দর্শন মূলত: এ জাতীয় মৌলিক প্রশ্নসমূহের উত্তর অনুসন্ধান ও ব্যাখ্যা করে। এসব প্রশ্নের যে বুদ্ধিসম্মত ব্যাখ্যা দানের চেষ্টা করেন দার্শনিকগণ সেটাকেই বলা হয় দর্শনের অনুধ্যানমূলক কাজ।

দর্শনের বিচারমূলক কাজ

দর্শনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো জীবন জগতের মৌলিক প্রশ্নসমূহ যা মানুষকে সব সময় ভাবিয়ে তোলে সে সকল প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করাই নয়, বরং সেগুলোর বিচার বিশ্লেষণ করা। সৃষ্টির রহস্য ও জটিলতা নিয়ে মানুষকে যে সব প্রশ্ন ভাবিয়ে তোলে সেগুলোর উত্তর সে সহজ বুদ্ধির মাধ্যমে খোঁজে। কিন্তু সহজ বুদ্ধির নির্বিচারী ব্যাখ্যা তার বিচারশীল মনকে কখনোই তুষ্ট করতে পারে না। অন্যদিকে বিজ্ঞানীরা বিনা বিচারেই কতকগুলো ধারণাকে মেনে নেয়, যেমন– জড়, কাল, কার্যকারণ সম্বন্ধ ইত্যাদি। তাছাড়া বিজ্ঞানীরা সব সময় বিশ্বকে দেখে খণ্ড খণ্ড আকারে এবং ফলে তা কেবল আংশিক জ্ঞানই দিতে পারে। কিন্তু খণ্ডিত এ জ্ঞান দার্শনিক মনকে সন্তুষ্ট করতে পারে না। কেননা দার্শনিক জগত জীবনকে দেখে সামগ্রিক দৃষ্টিতে। তাই জীবন জগত সম্পর্কিত প্রশ্নের আংশিক ও

খণ্ডিত ব্যাখ্যা নয়, সে চায় সকল প্রশ্নের পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা। আর তাই সহজ বুদ্ধির নির্বিচারী ব্যাখ্যা, বিশ্বাস বা প্রাধিকারের মাধ্যমে নয় বরং যুক্তির কষ্টি পাথরে দর্শন উত্থাপিত প্রশ্নসমূহের যথার্থ বিচার বিশ্লেষণ করা তার অন্যতম প্রধান কাজ। আর তাই জগত জীবনের মৌলিক প্রশ্নসমূহের যৌক্তিক ব্যাখ্যা ও যুক্তিসম্মত আলোচনান্তে তার সার্বিক মূল্যায়ন দর্শনের কাজ। সুতরাং দর্শনের কাজ বিচারমূলক।

দর্শনের সংগঠনমূলক কাজ

বিচার বিশ্লেষণ ও অনুধ্যানের পর দর্শন সবশেষে যে কাজটি করে তাহলো সংগঠনমূলক কাজ। যে সকল মৌলিক প্রশ্নের উত্তর দার্শনিকগণ অনুসন্ধান করেন সেগুলোর বিচার বিশ্লেষণ করেই দার্শনিকগণ ক্ষান্ত হয় না বরং বিচার বিশ্লেষণের পর যে পূর্ণাঙ্গ ধারণা পাওয়া যায় তার মূল্যায়ন করে একে একটি সাংগঠনিক রূপ দেয়াও দর্শনের অন্যতম কাজ। বিজ্ঞানীদের দেয়া খণ্ড খণ্ড ধারণা ও সাধারণ জ্ঞানের ভাল ও আকর্ষণীয় দিকগুলোর মধ্যে একটি সমন্বয় সাধন করে থাকে দর্শন। দর্শন খণ্ডিত বিষয়গুলোর মধ্যে একটি শৃঙ্খল ও মৌলিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করে থাকে। মোট কথা বস্তুর অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সত্তার স্বরূপ। সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের আদর্শ, স্রষ্টার সাথে স্রষ্টার সম্পর্কের স্বরূপ ইত্যাদি নিয়ে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে এ বিশ্ব জগতের একটি মূলসত্তার সন্ধান ও আবিষ্কার করাই দর্শনের গঠনমূলক কাজ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.২

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. দর্শন মূলত: কোন ধরনের প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করে?
   ক. সাধারণ
   খ. গবেষণাধর্মী
   গ. মৌলিক প্রশ্নসমূহের
   ঘ. যৌগিক

২. দর্শনের কাজকে কয়টি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়?
   ক. ৩টি
   খ. ৫টি
   গ. ৪টি
   ঘ. ৫টি

৩. দর্শন সবকিছুকে কোন দৃষ্টিতে দেখে?
   ক. সামগ্রিক দৃষ্টিতে
   খ. বিশেষ দৃষ্টিতে
   গ. বুদ্ধিগত দৃষ্টিতে
   ঘ. অভিজ্ঞতার দৃষ্টিতে

উত্তরমালা: ১. গ, ২. ক, ৩. ক

খ. সংক্ষিপ্তমূলক প্রশ্ন

১. দর্শনের অনুধ্যানমূলক কাজ বলতে কী বুঝায়?
২. দর্শনের গঠনমূলক কাজ কী?
৩. দর্শনের বিচারমূলক কাজ বলতে কী বুঝায়?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. দর্শনের কাজ কী আলোচনা করুন।
২. দর্শন কী? দর্শনের বিচারমূলক কাজ ব্যাখ্যা করুন।
৩. দর্শনের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করুন। এর প্রধান কাজ কী ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ- ২.৩: দর্শনের সাথে শিক্ষা দর্শনের সম্পর্ক

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- দর্শন ও শিক্ষা দর্শন কী তা বলতে পারবেন।
- দর্শনের সাথে শিক্ষা দর্শনের সম্পর্ক কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

দর্শনের সাথে শিক্ষা দর্শনের সম্পর্ক

শিক্ষার্থী বৃন্দ, দর্শনের সাথে শিক্ষা দর্শনের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ। কেননা শিক্ষা দর্শনের অন্যতম প্রধান কাজ হচ্ছে শিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় তত্ত্ব ও মতবাদ সরবরাহ করাসহ যাবতীয় সমস্যায় দার্শনিক পদ্ধতির প্রয়োগ, শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ণয় করা এবং মান সম্পন্ন শিক্ষার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি ও প্রয়োজন অনুযায়ী নবতর শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন ও বিনির্মাণ করা। দর্শনের সাথে শিক্ষা দর্শনের সম্পর্ক নির্ণয় করতে হলে প্রথমে আমাদের জানতে হবে দর্শন ও শিক্ষা দর্শন বলতে কী বুঝায়।

দর্শনের প্রকৃতি

প্রথমেই জেনে নেই 'দর্শন' কী। বাংলা 'দর্শন' শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে সংস্কৃত দৃশ ধাতু থেকে যার অর্থ দেখা বা প্রত্যক্ষণ করা। কিন্তু এখানে শব্দটি তত্ত্বদর্শন অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। ইংরেজি Philosophy শব্দটির উৎপত্তি গ্রীক শব্দ Philos ও Sophia থেকে। Philos শব্দের অর্থ অনুরাগ ও Sophia শব্দের অর্থ জ্ঞান। ফলে উৎপত্তিগত দিক থেকে শব্দটির অর্থ দাঁড়াচ্ছে "জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ" আর Philosopher অর্থ জ্ঞানানুরাগী। দার্শনিক সক্রেটিস নিজেকে জ্ঞানী না বলে জ্ঞানানুরাগী বলে মনে করতেন। সুতরাং প্রজ্ঞা বা জ্ঞানের প্রতি যার অনুরাগ আছে তিনিই প্রকৃত দার্শনিক পদবাচ্য। বাংলায় যাকে আমরা দর্শন বলি তার আলোচ্য বিষয় ও লক্ষ্য উদ্দেশ্যের সাথে ইংরেজিতে Philosophy নামক বিষয়টির হুবহু মিল বা সাদৃশ্য থাকার কারণেই 'Philosophy'-এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে 'দর্শন' নামক বিষয়টিকেই গণ্য করা হয়।

দর্শনকে সংজ্ঞায়িত করার প্রয়াস অনেকেই পেয়েছেন কিন্তু দার্শনিক ও দর্শন অনড় বা স্থির কিছু নয়, বরং সদা গতিশীল। কেননা যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে জীবন ঘনিষ্ঠ আলোচনার অগ্রসর হয় দর্শনে। আর তাই দার্শনিক মতবাদগুলো সব সময় পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়ে চলেছে। তাই নিছক একটি সংজ্ঞার মাধ্যমে দর্শনের স্বরূপ ও তাৎপর্য উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। তবে দর্শনের আলোচ্যসূচি, পরিধি ও দার্শনিকের কাজের প্রকৃতি সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বে প্রথম ইউনিটে আলোচনা করেছি আর সেখান থেকে দর্শনের প্রকৃতি ও কাজ সম্পর্কেও ধারণা পেয়েছি। তাতে আমরা দেখেছি জ্ঞানের এমন কোন শাখা নেই যার আলোচনা দর্শনের আওতার বাইরে। জীবন জগতের মৌলিক প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানে ব্যাপৃত দার্শনিকগণ যে যৌক্তিক পদ্ধতিতে সত্য অনুসন্ধানের কাজ করেন তা নয় মূল্যায়নের কাজটিও দর্শনই করে। তাই দর্শনের সমস্ত আলোচ্য বিষয়বস্তুকে মোটামুটি দশটি শ্রেণিতে ভাগ করা যেতে পার। যেমন– (১) বিশ্বতত্ত্ব; (২) তত্ত্ববিদ্যা; (৩) জ্ঞানবিদ্যা; (৪) মূল্যবিদ্যা; (৫) নীতিবিদ্যা; (৬) ধর্ম দর্শন; (৭) সমাজ দর্শন (৮) রাষ্ট্র দর্শন; (৯) মনোবিজ্ঞান ও (১০) নৃবিদ্যা।

দর্শন জীবন জগতে যে সমস্যা বা প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করে যেগুলো হলো আমি কে? আমি কোথায় থেকে এলাম? ঈশ্বর কী? ঈশ্বর বলে আদৌ কিছু আছে কী? আত্মা কী? আত্মা অমর কী না ইত্যাদি। মোটকথা জীবন ও জগত নিয়ে যে সর্বজনীন প্রশ্নগুলো আছে এবং ভবিষ্যতেও যে সব প্রশ্ন দেখা দিতে পারে সেগুলোও দর্শনের

আলোচ্য বিষয়। তবে মনে রাখতে হবে যে, দর্শনের দৃষ্টি কেবল পদ্ধতি বা উপায়ের দিকে নয়; বরং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের দিকে। দর্শন উপায়কে উদ্দেশ্যের আলোকে নিরীক্ষা করে। দর্শন সমগ্র সমস্যার খুটিনাটি সকল দিক পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করেই কেবল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। এটা একটা গতিশীল ও চলমান প্রক্রিয়া।

কাজেই দার্শনিক সমস্যা, পদ্ধতি, বিষয়বস্তু, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের দিক থেকে বিশ্লেষণ করে দর্শনের স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে আমরা সংক্ষেপে বলতে পারি যে, জ্ঞানার্জনের যে শাখাটি জীবন ও জগতের মৌলিক প্রশ্নাবলির যৌক্তিক বিচার বিশ্লেষণ করে সমস্যার প্রকৃত তাৎপর্য সম্বন্ধে আমাদেরকে সম্যক অবগত করে তাকেই বলে দর্শন। দর্শন জীবন ও জগতের সর্বজনীন ও বিচারমূলক মূল্যায়ন। সুতরাং প্রচলিত পথ পরিহার করে দর্শনের সমস্যাবলি, বিষয়বস্তু, পদ্ধতি এবং উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যের দিক থেকেই দর্শনের স্বরূপ ও তাৎপর্য নির্ণয় করাই যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। এখন আমরা দেখব শিক্ষা দর্শন বলতে কী বুঝায়?

শিক্ষা দর্শনের প্রকৃতি

দর্শনের যে প্রকৃতি ও পরিচয় আমরা পেয়েছি তাতে দেখা যাচ্ছে যে, দর্শন জীবন ঘনিষ্ঠ একটি বিষয়, জীবন বিচ্ছিন্ন নয়। কী ব্যক্তি জীবন, কী সমাজ জীবন উভয় জীবনেরই একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য রয়েছে যা তার মূল্যবোধ, বিশ্বাস ও আদর্শ দ্বারা চালিত হয়। দর্শন এ বিষয়গুলোর প্রত্যেকটিকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করে দেখায় তাই নয় কোনটি জীবনের জন্য শ্রেয় ও কল্যাণকর অথবা কোনটি ভাল বা মন্দ কিংবা উচিত বা অনুচিত এসব নির্দেশনা দেয়া যেমন দর্শনের কাজ এবং তা বাস্তবায়নের পথও দেখায় দর্শন। আর দর্শনের সে কাজটি করার জন্যই উপায় বা মাধ্যম হচ্ছে শিক্ষা। শিক্ষা ব্যতীত মূল্যবোধ গঠন ও বাস্তবায়ন কোনটিই সম্ভব নয়। শিক্ষার কাজই হলো সুপ্ত প্রতিভা ও গুণাগুণকে বিকশিত ও বাস্তবায়িত করা, অস্পষ্টকে পরিস্ফুটিত করে তোলা। অকল্যাণের পরিবর্তে কল্যাণকে প্রতিষ্ঠা করা। এ কারণেই স্যার জন এডামাস বলেন, শিক্ষা হল দর্শনের গতিময় দিক। বলা যায় শিক্ষার আদর্শ নির্ণয়ের তাত্ত্বিক দিক হল দর্শন আর দার্শনিক বিশ্বাসের বিধৃত করার ব্যবহারিক উপায় হল শিক্ষা। কাজেই শিক্ষা ও দর্শন এক অপরের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। এ জন্যই প্রকৃত দার্শনিক মাত্রই, প্রকৃত শিক্ষক। কেননা সত্য বা জ্ঞান অন্বেষণ করেন দার্শনিক। আর এ জ্ঞানান্বেষণকেই প্রকৃত শিক্ষা বলা যায়।

দার্শনিক মাত্রই শিক্ষাবিদ না হয়ে পারেন না। কেননা জীবন জগতের যে মৌলিক প্রশ্নগুলোর যৌক্তিক ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা দার্শনিকরা করেন তার লক্ষ্য হলো পৃথিবীতে মানুষের জন্য সুষ্ঠু ও সুন্দর জীবন যাপনের পরিবেশ তৈরি করে দেয়া। যেমন, আমি কে? কোথা থেকে এলাম? আমার দায়িত্ব বা করণীয় কী? এসব প্রশ্ন উত্থাপন ও তাদের উত্তর দান করা মানব জীবনের জন্য খুবই জরুরি। কাজেই দর্শন মানুষকে যে আদর্শের দিকে পথ নির্দেশ করে তা বাস্তবায়নের কাজটি করে শিক্ষা। শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য শুধু সুপ্ত গুণাবলির পূর্ণ বিকাশ ঘটানো তা নয়, সেই সাথে ব্যক্তিকে প্রভাবিত ও প্ররোচিত করা একটি আদর্শিক সমাজ গঠনের দিকে। অর্থাৎ শিক্ষার কাজ লক্ষ্য অভিমুখী তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই লক্ষ্যটি কী হওয়া উচিত সেই তাত্ত্বিকদিকটি উন্মোচন করে দেয় দর্শন। তাই দর্শন হচ্ছে শিক্ষার উৎস ও ভিত্তি ভূমি যা থেকে শিক্ষা তার প্রয়োজনীয় উপায় ও উপকরণ সংগ্রহ করে মানুষকে সঠিক দিক নির্দেশনা দেয় যাতে শিক্ষার্থী পরম কল্যাণ অর্জনে সক্ষম হয়। আর পরম কল্যাণের ধারণা সরবরাহ করে দর্শন ও দার্শনিক।

দর্শন কেবল তত্ত্ব সরবরাহ করে তা নয়, পদ্ধতি গত দিক থেকে বিচার করলে দর্শন একটি দৃষ্টিভঙ্গি। দর্শন এমন কিছু পদ্ধতির কথা বলে যা কেবল দার্শনিক সমস্যা চিহ্নিতকরণে ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণেই ভূমিকা রাখে তা নয়, এ পদ্ধতিগুলোকে শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম পরিচালনায় সক্রিয় ভূমিকা রাখতে সক্ষম। কেননা দর্শন এক সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে সার্বজনীন সমস্যাগুলোর সমাধানের প্রয়াস পায়। আর তাই শিক্ষা কার্যক্রম ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো

যে সমস্যার সম্মুখীন হোক না কেন সেক্ষেত্রে দার্শনিক পদ্ধতিগুলোকে কাজে লাগিয়ে অনায়াসেই শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করতে পারে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, শিক্ষা প্রক্রিয়া বা শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রমকে কেবল তাত্ত্বিকতার দিক দিয়েই দর্শনের শরণাপন্ন হয় তা নয়; বরং পুরো প্রক্রিয়াটিকে বাস্তবায়নের জন্য যে পদ্ধতিগুলো প্রয়োগ করা প্রয়োজন সে দিক দিয়েও দর্শনের উপরেই নির্ভরশীল। দর্শনকে বাদ দিয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু সফল বাস্তবায়ন কখনোই সম্ভব নয়।

কাজেই আলোচনার এ পর্যায়ে আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে, শিক্ষা দর্শন বলতে যে বিষয়টিকে বুঝায় তা দর্শন ও শিক্ষার একটি সুসামঞ্জস্যপূর্ণ যৌক্তিক সমন্বয় যাকে বলা যায় শিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় দার্শনিক তত্ত্ব ও মতবাদ সরবরাহ করা সহ যাবতীয় সমস্যায় দার্শনিক পদ্ধতির প্রয়োগ, শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ণয় এবং উপযুক্ত শিক্ষার পরিবেশ তৈরি ও প্রয়োজন অনুযায়ী নবতর শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন ও বিনির্মাণ করা।

দর্শন ও শিক্ষা দর্শনের সম্পর্ক

দর্শন ও শিক্ষা দর্শন হলো একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। কেননা দর্শনকে বাদ দিয়ে শিক্ষা দর্শন গড়ে উঠতে পারে না। আবার শিক্ষা ব্যতীত দর্শনের পান্ডিত্য বা জ্ঞান অর্জন সম্ভব নয়। দার্শনিক মাত্রই সত্যানুসন্ধানী ও জ্ঞানানুরাগী (Love of Wisedom)। যে কোন ধরনের জ্ঞান অন্বেষণই করতে হলে প্রয়োজন শিক্ষা। শিক্ষাই জ্ঞানের সকল শাখার দ্বার উন্মোচন করে দেয়। আবার অর্জিত জ্ঞানকে বিতরণ করার জন্যও শিক্ষন-শিখন কার্যক্রমই হচ্ছে সর্বোত্তম মাধ্যম বা উপায়। এ জন্যই কোন বিশেষ বিষয়ে কোন গবেষক যখন সকলভাবে তার কাজ সম্পন্ন করতে পারেন তাকে দর্শনের পণ্ডিত বা ডক্টর অব ফিলোসফি (Ph.D) উপাধিতে ভূষিত করা হয়। প্রাচীন কালের প্রখ্যাত গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস সমাজকে শিক্ষিত করে তোলার জন্য বিভিন্ন বিষয়ে আরোহ অবরোহ পদ্ধতি ও জ্ঞানমূলক আলোচনায় নিজেকে ব্যস্ত রাখতেন এথেন্স নগরীর ব্যস্ততম জায়গাগুলোতে। তার উদ্দেশ্য ছিল সমাজ থেকে গোঁড়ামী ও কুসংস্কার দূর করে প্রকৃত জ্ঞান অন্বেষণ ও বিতরণের মাধ্যমে যুব সমাজকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা। এটা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, দার্শনিক মাত্রই শিক্ষক এবং শিক্ষার আলো বা জ্ঞান বিতরণের কাজটি তাঁরা সব যুগেই সম্পন্ন করেছেন। মূল্যবোধ, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, দেশপ্রেম প্রভৃতি বিষয়গুলো জাতীয় শিক্ষানীতিতে যাতে প্রতিফলিত হয় সেদিকে দৃষ্টি রেখেই শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণীত হয়। আর এসব কিছুই দর্শনের কাজ। শিক্ষা দর্শন শিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় সমস্যার সমাধান করাসহ শিক্ষার গুণগত মান বজায় রাখার কাজটি করে থাকে তাই নয়, শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরি করা, সংরক্ষণ করাসহ নতুন নতুন দিগন্ত আবিষ্কারও শিক্ষা দর্শনের কাজ। অন্যদিকে, দার্শনিক পদ্ধতিগুলো প্রয়োগ করেই শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি ও কৌশলগুলো আবিষ্কার করা হয়। এজন্য বলা হয়, দার্শনিক মাত্র শিক্ষা বিজ্ঞানী এবং শিক্ষক মাত্রই কোন না কোনভাবে দার্শনিক পদবাচ্য। একটিকে বাদ দিয়ে অপরটি অর্থহীন। বরং এ দু'য়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র আছে। সুতরাং দর্শন ও শিক্ষা দর্শনের সম্পর্ক নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৩

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. শিক্ষা দর্শনের প্রধান কাজ কী?
   ক. শিক্ষার প্রকৃতি নির্ণয় করা
   খ. মানসম্পন্ন শিক্ষার পরিবেশ তৈরি করা
   গ. শিক্ষাকে জীবন ঘনিষ্ঠ করা
   ঘ. উপরের সব ক'টি

২. নবতর শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন করে কোন বিষয়?
   ক. দর্শন
   খ. শিক্ষা দর্শন
   গ. জাতীয় শিক্ষা বোর্ড
   ঘ. জাতীয় শিক্ষাক্রম

৩. উপায়কে উদ্দেশ্যের আলোকে নিরীক্ষা করে কে?
   ক. দর্শন
   খ. শিক্ষা দর্শন
   গ. শিক্ষাক্রম
   ঘ. পাঠ্যসূচি

উত্তরমালা: ১. ঘ, ২. খ, ৩. ক

খ. সংক্ষিপ্তমূলক প্রশ্ন

১. দর্শনের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করুন।
২. শিক্ষা ও দর্শনের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করুন।
৩. দর্শন ও শিক্ষা দর্শন কীভাবে সম্পৃক্ত?
৪. শিক্ষা দর্শন বলতে কী বুঝায়?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. দর্শনের প্রকৃতি নির্ণয় করুন। শিক্ষা ও দর্শনের মাঝে সম্পর্ক নির্ণয় করুন।
২. শিক্ষা দর্শনের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করুন। শিক্ষা দর্শন দর্শনের সাথে কিভাবে সম্পৃক্ত? আলোচনা করুন।
৩. দর্শন ও শিক্ষা দর্শনের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করুন। দর্শন ছাড়া শিক্ষা দর্শন কী সম্ভব? মন্তব্য করুন।

পাঠ- ২.৪: শিক্ষাদান পদ্ধতি ও দর্শনের পদ্ধতি

[

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- শিক্ষাদান পদ্ধতিগুলোর নাম বলতে পারবেন।
- শিক্ষাদান পদ্ধতিগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- উত্তম শিক্ষাদান পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে পারবেন।
- শিক্ষাদান পদ্ধতির সাথে দর্শনের পদ্ধতির তুলনা করতে পারবেন।

শিক্ষাদান পদ্ধতির তাৎপর্য ও গুরুত্ব

শিক্ষাদান একটি যৌথ এবং দ্বিমুখী প্রক্রিয়া। অধ্যাপক রাস্কির মতে, শিক্ষাদান পদ্ধতির কাজ হচ্ছে শিশু ও তার শিখনীয় বিষয়ের মধ্যে কাঙ্ক্ষিত বন্ধন অক্ষুন্ন রাখা। শিক্ষাদান পদ্ধতির গুরুত্ব সম্পর্কে বলতে গিয়ে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ মরিস বলেন, শিক্ষাদান পদ্ধতি হচ্ছে জ্ঞানদান ও শিক্ষা গ্রহণে একটি ধারাবাহিক ও সহায়ক প্রক্রিয়া এবং তা শিক্ষককে এমন কিছু কলাকৌশল তৈরি ও ব্যবহারের সুযোগ দিয়ে থাকে যা শিক্ষার্থীদের যথার্থ বিকাশ, উন্নয়ন ও জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করে। মোটকথা, পদ্ধতি হচ্ছে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা গ্রহণ, শিক্ষকের পরিকল্পনা গ্রহণ, নির্দেশনা দান, সহযোগিতা ও অংশগ্রহণ এবং মূল্যায়নের প্রক্রিয়া।

শিক্ষণ-শিখন কতখানি কার্যকর হবে তা নির্ভর করে শিক্ষকের শিক্ষা পদ্ধতি ও কলাকৌশলের দক্ষতাপূর্ণ প্রয়োগের উপর। শিক্ষকের পাণ্ডিত্য এবং তার তত্ত্বীয় জ্ঞানের ভাণ্ডার উপযুক্ত ও কার্যকর পদ্ধতি প্রয়োগের অভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে পারে। তাই প্রত্যেক শিক্ষক উচিত শিক্ষাদানের পদ্ধতি ও বিভিন্ন কৌশল ও তার প্রয়োগ সম্বন্ধে সঠিক ধারণার অধিকারী হওয়া। শিক্ষাদান পদ্ধতি কতকগুলো ধাপ বা সোপানের সমষ্টিগত রূপ। কিভাবে এই সোপান বা ধাপগুলোকে একত্র করে একটি সুসমন্বিত ও চিন্তাকর্ষক প্রক্রিয়ায় রূপান্তরিত করা যেতে পারে সে বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করা শিক্ষকের দায়িত্ব। আর এই দায়িত্ব তিনি তখনই সঠিকভাবে পালন করতে পারবেন যখন পদ্ধতিগুলোর যৌক্তিকতা বা যথার্থতা, গুরুত্ব ও গুণাগুণ সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান থাকবে। শুধু তাই নয়, একটি উৎকৃষ্ট বা উন্নত শিক্ষাদান পদ্ধতির কী কী গুণ বা বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার সে বিষয়েও শিক্ষকের সম্যক অবগত হতে হবে। আর এসব কিছুই নির্ণয় করেন শিক্ষা দর্শন। শিক্ষাদান পদ্ধতির যৌক্তিকতা ও গুণাগুণ বিচার করে তার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন শিক্ষা দর্শন। আর সে কারণেই দর্শনের পদ্ধতিগুলোর সাথে শিক্ষাদান পদ্ধতির যে যোগসূত্র রয়েছে তা জানা দরকার।

উত্তম শিক্ষাদান পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য

যে কোন শিক্ষাদান পদ্ধতির দু'টি বিশেষ গুণ থাকা দরকার। যেমন, (১) মনস্তত্ত্ব সমন্বিতগুণ এবং (২) যৌক্তিক গুণ। মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি হিসেবে পদ্ধতিটির মাঝে যে গুণটি থাকবে তাহলো শিশুর মানসিক ও শারীরিক বিকাশের উপর ভিত্তি করে শিশুর যোগ্যতা ও দক্ষতার প্রেক্ষিতে শিক্ষাদান পদ্ধতি ও কলাকৌশলের ব্যবহার। আর যৌক্তিক ভিত্তি দ্বারা বুঝায় শিক্ষাদান পদ্ধতিকে ধারাবাহিকতার সাথে সম্পৃক্ত করাকে। যেমন, একটি সুবিন্যস্ত সোপানের মাধ্যমে যৌক্তিকভাবে শিক্ষার্থীকে জানা থেকে অজানায় অথবা চারিপাশের পরিচিত বস্তু থেকে ধীরে ধীরে দূরের দিকে নিয়ে যাও। স্বাভাবিকভাবেই যে প্রশ্নটি আসে তাহলো শিক্ষাদানের জন্য কোন উৎকৃষ্ট বা উত্তম পদ্ধতি কী রয়েছে? যদি থাকে তবে তার বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী? গবেষণায় দেখা গেছে, বিভিন্ন পরিবেশে একই পদ্ধতি ব্যবহার

করে বিভিন্ন রকম ফল পাওয়া গেছে। অর্থাৎ একেক বিষয়ের জন্য একেক পদ্ধতি কার্যকর ও ফলপ্রসূ হয়। বিষয়বস্তুর বিন্যাস, পদ্ধতি ব্যবহারের প্রস্তুতি ও প্রয়োগ এবং তারতম্যের উপর পদ্ধতির উপযোগিতা নির্ভর করে। তবে যে পদ্ধতিই ব্যবহার করা হোক না কেন, নিচের বৈশিষ্ট্যগুলো থাকলে তাকে উৎকৃষ্ট উত্তম পদ্ধতি হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে–

১. শিখনফল বা পাঠের উদ্দেশ্য অর্জন সহায়ক।
২. শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা ও আচরণে পরিবর্তন আনতে সহায়ক।
৩. শিক্ষার্থীর বয়স, যোগ্যতা, আগ্রহ ও অভিরুচির সাথে পদ্ধতির সামঞ্জস্য থাকা।
৪. শিক্ষার্থীর মাঝে আগ্রহ ও কৌতূহল উদ্রেক করা।
৫. শিক্ষার্থীদেরকে জানা থেকে অজানায় এবং নতুন কিছু জানতে আগ্রহী করে তোলা।
৬. শিক্ষার্থীকে স্বেচ্ছায় শিক্ষা গ্রহণের প্রতি আগ্রহান্বিত করে তোলা।
৭. পাঠদান ধারাবাহিক ও পরস্পর সম্পর্কিত করে তোলা।
৮. পাঠদানকে সুপরিকল্পিত ও সুবিন্যাস্ত করা।
৯. পরিবর্তনশীল ও বাস্তবসম্মত করা।
১০. চিত্তাকর্ষণ ও ফলপ্রসূ করার জন্য সঠিক উপায়ে উপকরণ ব্যবহার উপযোগী করা।

শিক্ষাদান পদ্ধতি ও কৌশল

একজন শিক্ষক শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতির ব্যবহার ও প্রয়োগ করতে পারেন। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, কোন পদ্ধতি ও কলাকৌশল ব্যবহার করলে শিক্ষাদান বেশী আকর্ষণীয় ও ফলপ্রসূ হবে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক যে পদ্ধতিগুলো শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়ে আসছে সেগুলো হচ্ছে– (১) আলোচনামূলক পদ্ধতি; (২) প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি; (৩) প্রজেক্ট পদ্ধতি; (৪) পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি; (৫) আরোহী ও অবরোহী পদ্ধতি; (৬) আবিষ্কার পদ্ধতি; (৭) সমন্বিত পদ্ধতি; (৮) বক্তৃতা পদ্ধতি; (৯) প্রদর্শনী পদ্ধতি; (১০) অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি (মাথা খাটানো, মাইন্ডম্যাপিং, দলীয় আলোচনা, দলীয় প্রকল্প; (১১) অবিরাম পদ্ধতি (Continuum); (১২) পোস্টবক্স পদ্ধতি; (১৩) সমস্যা সমাধান পদ্ধতি এবং (১৪) সাক্ষাৎকার পদ্ধতি ইত্যাদি।

শিক্ষাদানের পদ্ধতিরূপে উপরোক্ত পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করা হয় এবং এই পদ্ধতিগুলো প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন কলাকৌশল অবলম্বন করা হয়। তবে পদ্ধতিগুলোর প্রত্যেকটিরই যৌক্তিক ও মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি রচিত হয়েছে দার্শনিক ও শিক্ষা বিজ্ঞানী কর্তৃক। আর তাই পদ্ধতিগুলো কোন না কোনভাবে দার্শনিক আলোচনার পদ্ধতির সাথে সম্পৃক্ত বলা চলে। দার্শনিক আলোচনার পদ্ধতিগুলোই শিক্ষাদান পদ্ধতির উৎসরূপে কাজ করেছে। দর্শন আলোচনার পদ্ধতিগুলো কীভাবে শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ার পদ্ধতিগুলোরে ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে এখন আমরা সে বিষয়টিই নির্ণয়ের চেষ্টা করা।

শিক্ষাদান পদ্ধতির সাথে দার্শনিক পদ্ধতির সম্পর্ক

যে কোন বিষয় সম্পর্কে একটি সুশৃঙ্খল ও সুবিন্যস্ত আলোচনার জন্য একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়। আর তাই আমরা বিভিন্ন বিষয়ের বিভিন্ন পদ্ধতি দেখতে পাই। দার্শনিক বিষয়াদির আলোচনার ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। কতকগুলো বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করেই দার্শনিকগণ জগত ও জীবন সম্পর্কে সার্বিক জ্ঞান লাভের প্রয়াস পেয়েছেন। দর্শনের এই শাখাটি পদ্ধতিবাদ (Methodology) নামেই সর্বাধিক পরিচিত। দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট তিনটি দার্শনিক পদ্ধতির কথা বলেন, পদ্ধতিগুলো হচ্ছে নির্বিচারবাদী পদ্ধতি, বিচারবাদী পদ্ধতি ও সংশয়বাদী পদ্ধতি। এছাড়াও আরও কয়েকটি পদ্ধতির উল্লেখ দর্শনের ইতিহাসে পাওয়া যায় যেমন, দ্বান্দ্বিকতাবাদ, স্বজ্ঞাবাদ ও বিচার বিশ্লেষণী পদ্ধতি।

আমরা জানি যে, প্রত্যেক দার্শনিকই হচ্ছেন শিক্ষাবিদ। কেননা দার্শনিক মাত্রই জ্ঞানানুরাগী (Love of Wiseedom) ও সত্যানুরাগী। প্রজ্ঞা বা জ্ঞান অন্বেষণই দার্শনিকের কাজ। শিক্ষার্থীকে কীভাবে শিক্ষা দিলে বা বাস্তব সম্মত ও যৌক্তিক হবে তা যুক্তির কষ্টিপাথরে ক্ষুরধার প্রজ্ঞায় গভীর অনুধ্যানের মাধ্যমেই দার্শনিকগণ শিক্ষা বিজ্ঞানীর কাজটিও করেছেন। সুদূর প্রাচীন গ্রীসে যখন দার্শনিক সক্রেটিস যুব সমাজের সাথে জ্ঞান বিতরণের কাজ শুরু করেন তখন তিনি গল্প বলা পদ্ধতির মাধ্যমে যেমন শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে কথা বের করতেন আবার প্রশ্নোত্তর পদ্ধতিরও প্রয়োগ করেছেন। তবে তিনি আরোহণ ও অবরোহ দু'টো পদ্ধতিকেই প্রয়োগ করতেন। কেননা তিনি বিশেষ কোন বিষয়ে নিজে সিদ্ধান্ত দেখার আগে অন্যান্যদের অভিমত বা মতামত গ্রহণ করতেন প্রশ্ন উত্থাপনের মাধ্যমে। তারপর একটা সার্বিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতেন। পরবর্তীতে সেই পদ্ধতি আরো অনেকেই অনুসরণ করেন। আধুনিককালের প্রয়োগবাদী দার্শনিক জন ডিউই 'সমস্যা সমাধান' পদ্ধতি প্রয়োগের কথা বলেন যা খুবই জনপ্রিয় হয়েছে কিন্ডার গার্টেন শিক্ষায়। এছাড়া অংশগ্রহণমূলক যে পদ্ধতিগুলো রয়েছে, আবিষ্কার ও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি ও সবগুলোই কোন না কোনভাবে আরোহ-অবরোহ পদ্ধতির সাথে সংশ্লিষ্ট। প্রজেক্ট পদ্ধতিরও প্রকল্প গঠনের সাথে সংশ্লিষ্ট যা চিন্তা ও যুক্তিবিদ্যার পদ্ধতি। কাজেই শিক্ষাদান পদ্ধতিগুলো আসলে জ্ঞান অর্জনেরই পদ্ধতি এবং প্রত্যেকটি পদ্ধতিই কোন না কোনভাবে দার্শনিক পদ্ধতিগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট। বিচারবাদী ও বিশ্লেষণী পদ্ধতিও প্রভাব রয়েছে শিক্ষাদান পদ্ধতিতে। কেননা প্রত্যেকটি বিষয়ই অবধারণ দ্বারা গঠিত আর শিক্ষা সংক্রান্ত সব অবধারণই যাচাই করা হয় বিচার বিশ্লেষণী তথা যাচাইকরণ পদ্ধতির মাধ্যমে। অর্থ ও তত্ত্ব যাচাই না করে শিক্ষা ও শিক্ষাদান প্রক্রিয়ার কোনটিই ফলপ্রসূ করা সম্ভব নয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৪

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. শিক্ষাদান একটি দ্বিমুখী প্রক্রিয়া হিসেবে কী করে?
   ক. জ্ঞানদান ও শিক্ষা গ্রহণ
   খ. জ্ঞানবৃদ্ধি ও জ্ঞান অর্জন
   গ. জ্ঞান বিকাশ ও উন্নয়ন
   ঘ. জ্ঞান ও মূল্যের বিকাশ ঘটায়

২. শিক্ষাদান পদ্ধতির যৌক্তিকতা ও গুণাগুণ বিচার করে কোন বিষয়টি?
   ক. দর্শন
   খ. শিক্ষা দর্শন
   গ. মূল্যবিদ্যা
   ঘ. যুক্তিবিদ্যা

৩. শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য একজন শিক্ষক কী ব্যবহার ও প্রয়োগ করেন?
   ক. বিভিন্ন পদ্ধতির ব্যবহার
   খ. বোর্ড ও মার্কার ব্যবহার
   গ. পাঠ উপকরণের ব্যবহার
   ঘ. পাঠ্য বইয়ের ব্যবহার

৪. প্রত্যেক দার্শনিকই হচ্ছেন একজন শিক্ষাবিদ কারণ দার্শনিক অর্থ হচ্ছে–
   ক. জ্ঞানানুরাগী খ. সত্যানুসন্ধানী
   গ. মূল্য অনুসন্ধানী ঘ. সবগুলোই

উত্তরমালা: ১. ক, ২. খ, ৩. ক, ৪. গ

খ. সংক্ষিপ্তমূলক প্রশ্ন

১. শিক্ষাদানের পদ্ধতিগুলো কী কী?
২. শিক্ষাদান পদ্ধতির সাথে দার্শনিক পদ্ধতির কোন সম্পর্ক আছে কী?
৩. শিক্ষাদান পদ্ধতি ও কৌশলগুলোর একটি তালিকা করুন।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. শিক্ষাদান পদ্ধতির গুরুত্ব ও তাৎপর্য নির্ণয় করুন। একটি উত্তম শিক্ষাদান পদ্ধতির কী কী বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার বলে আপনি মনে করেন?
২. শিক্ষাদান পদ্ধতি ও কৌশল কত ধরনের হতে পারে? শিক্ষাদান পদ্ধতির সাথে দার্শনিক পদ্ধতির সম্পর্ক ব্যাখ্যা করুন।
৩. দার্শনিক পদ্ধতিগুলোর নাম উল্লেখ করুন। এই পদ্ধতিগুলো কীভাবে শিক্ষাদান পদ্ধতিকে প্রভাবিত করে ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন করুন।

পাঠ- ২.৫: শিক্ষাদানের তিন যুগ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- শিক্ষা দর্শনের প্রাচীনকাল ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- শিক্ষা দর্শনের আধুনিককাল সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- শিক্ষা দর্শনের সাম্প্রতিককাল সম্পর্কে বলতে পারবেন।

মানব জাতির শিক্ষা চিন্তার যে ইতিহাস আমরা দেখতে পাই বা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, একটা ক্রম বিবর্তনের মধ্য দিয়ে আজকের আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন হয়েছে। এক্ষেত্রে একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে সব যুগের শিক্ষা চিন্তার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য সবকালে একই রকম ছিল না। শিক্ষা দর্শন শিক্ষা ক্ষেত্রে উদ্ভুত যাবতীয় সমস্যা সমাধানে যে দিক নির্দেশনা দিয়েছে তাতে শিক্ষা চিন্তার বিশেষ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। আজকের যে বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থা তা প্রায় আড়াই হাজার বছরের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের ফল। তাই পাঠের সুবিধার্থে এগুলোকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যেতে পারে। যেমন– (১) প্রাচীন কাল (১৪০০ খ্রীষ্টাব্দ); (২) আধুনিক কাল (১৪০০-১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ) এবং (৩) সাম্প্রতিক কাল (১৯০০ সাল)।

প্রাচীন কাল

প্রাচীন কালে শিক্ষার অস্তিত্ব ছিল একথা সত্য কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বলতে যা বোঝায় তেমন কোন শিক্ষার অস্তিত্ব ছিল না। সে সময়ে শিক্ষা ছিল অনানুষ্ঠানিক ও সহজ প্রকৃতির এবং তা অনেকটা রক্ষণশীলও বটে। কারণ সে সময় মানুষ গোষ্ঠীবদ্ধভাবে জীবন যাপন করতো। আর গোষ্ঠী জীবনের ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রাখার জন্য যা জরুরি সেটাই ছিল শিক্ষার লক্ষ্য, যেমন– গোষ্ঠীগত লোকাচার বা রীতি-নীতির অনুসরণ, সংরক্ষণ ও স্থায়ীকরণ প্রভৃতি শিক্ষার তথা জীবনের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। তবে ব্যতিক্রমও লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীন চীন, ভারত ও গ্রীস নগরীতে। যেমন– চীনের আদর্শ ছিল জ্ঞান অর্জনের জন্যই জ্ঞান অর্জন করা। অর্থাৎ জ্ঞানকে তারা সচেতনভাবেই জ্ঞান অর্জনের জন্য শিক্ষা গ্রহণ করতেন। তবে সেজন্য কোন শিক্ষাক্রম বা পাঠ্যসূচি ছিল না।

অন্যদিকে ভারতীয়, শিক্ষার আদর্শ ছিল সহনশীলতা, পারস্পরিক সহযোগিতা, বাধ্যতা ও অত্মসম্পনের চর্চা করা। সেখানে প্রাচীন ভারতে ধর্ম যাজকগণই শিক্ষা গুরুর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। সে সময়ে গৃহ শিক্ষক রেখে শিক্ষা গ্রহণের প্রথা যেমন চালু ছিল তেমনি ধর্মীয় গুরুর কাছে গিয়ে শিক্ষা গ্রহণের প্রথাও চালু ছিল। যেমন– বৌদ্ধমঠগুলো জ্ঞান চর্চার ও জ্ঞান আদান প্রদানের কেন্দ্র বিন্দুছিল। এভাবে বিভিন্ন মসজিদ, মন্দির, খানকাহসহ মক্তব শিক্ষা গ্রহণের উৎস হিসেবে কাজ করেছে।

প্রাচীন গ্রীসে সামরিক দক্ষতা অর্জনের উপর গুরুত্ব দেয়া হতো। সে জন্য প্রত্যেক নাগরিককে সামরিক শিক্ষা গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয়। আর এথেন্স নগরীতে সামাজিক ও ব্যক্তিগত উভয় প্রকার যোগ্যতার বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধনই ছিল সেখানকার শিক্ষার লক্ষ্য। বিশেষ করে যুব সমাজকে শিক্ষিত করার লক্ষ্যে দার্শনিক সক্রেটিস এথেন্সে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

সংক্ষেপে বলা যায় যে, প্রাচীনকালের শিক্ষাক্রম ছিল প্রধানত খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের সাথে সর্ম্পকৃত এবং পরবর্তীতে তা পশু শিকার করা, মাছ ধরা ও খাদ্য সংগ্রহের কৌশল শেখানোর সাথে জড়িত। এ ছাড়াও নাচ, গান, কবিতা পাঠ, শরীর চর্চা, প্রবাদ, শ্লোক, গল্প বলা, পুরাণের কথা প্রভৃতি শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল। লিপি

আবিষ্কারের পর থেকে লেখা, পড়া ও গণিত শিক্ষাদান শুরু হয়। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকের মধ্যেই আইন, দর্শন ইত্যাদিও শিক্ষাক্রমের আওতাভুক্ত হয়। ৭০০-১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দের সময়কালের মুসলমান মনীষীগণ লেখা, পড়া, গণিত ও ধর্মীয় সাহিত্যের পাঠদানের পাশাপাশি চিকিৎসা বিজ্ঞান ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক বিষয়েও পাঠদান করতে থাকেন।

পাঠদান পদ্ধতি

প্রাচীনকালে শিক্ষাদানের কর্তৃত্ব ন্যস্ত ছিল পরিবার, গোত্র প্রধান ও ধর্মযাজকদের উপর। পরবর্তীকালে ব্যক্তিগত শিক্ষক ও গুরুগৃহ প্রথার প্রচলন হয়। প্রাথমিক যুগের শিক্ষা কেবল অগ্রজদের অনুকরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এ সময় শিক্ষকগণ কি করতে হবে তা বলতেন এবং কিভাবে করতে হবে তার প্রশিক্ষণ দিতেন। লিখিত ভাষার বিকাশ ও সাহিত্য সৃষ্টির পর থেকে প্রশিক্ষণের সাথে সাথে পঠন পাঠন ও নির্দেশনা দানও শিক্ষা পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই স্মৃতি নির্ভর পদ্ধতির প্রাধান্য ছিল। ধর্মীয় অনুশাসন, সঙ্গীত, গল্প ও রীতি প্রথার সমন্বয়ে গড়ে উঠেছিল সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার। প্রতিটি প্রজন্মের দায়িত্ব ছিল মুখস্থ করে সেগুলোকে সংরক্ষণ করা। নবম শতকের পর থেকেই মুসলমান মনীষীগণ পরীক্ষণের মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষাদানের পদ্ধতি জনপ্রিয় করে তোলেন। তবে ইউরোপ তখনও নিষ্ফল বাগড়ম্বর, অহেতুক বিচার বিশ্লেষণ এবং মুখস্থকরণসহ পদ্ধতি হিসেবে প্রচলিত ছিল।

আধুনিক কাল (১৪০০-১৯০০)

বিভিন্ন দার্শনিকের শিক্ষা সম্পর্কিত অভিমত

চতুর্দশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য জগতের রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে যে পরিবর্তনের সূচনা হয় এবং পঞ্চদশ শতাব্দিতে এসে যার চূড়ান্ত রূপ পরিলক্ষিত হয় তাকে বলা হয় রেনেসাঁ বা পূন:জাগরণ। এই সময় গ্রিক ও লাতিন ভাষায় রচিত প্রাচীন সাহিত্যের মানবতাবাদী উপাদানসমূহের প্রতি আগ্রহের পূনর্জাগরণ হয়। মধ্যযুগে মঠাশ্রয়ী ও ধর্মের যৌক্তিক ব্যাখ্যাদানকারী পণ্ডিতদের প্রভাবে শিক্ষার লক্ষ্য ও বিষয়বস্তু ছিল ঈশ্বরকেন্দ্রিক। কিন্তু মানবতাবাদী শিক্ষাবিদরা মানুষের ইহজাগতিক অভিজ্ঞতার প্রতি বেশি আগ্রহ প্রকাশ করেন। মানবতাবাদী শিক্ষা দার্শনিকদের অন্যতম হিসেবে ডেসিডিরিয়াস ইরানমাসের (১৪৬৬-১৫৩৬) নাম উল্লেখ করা যায়। তাঁর মতে, শিক্ষার প্রথম ও প্রধান কাজ হচ্ছে শিশু মনকে ভক্তি রস পান করানো, দ্বিতীয়ত: দর্শন ও সাহিত্যের প্রতি আগ্রহী করে তোলা এবং ভালভাবে শেখানো, তৃতীয়ত: জীবনের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে জানানো, চতুর্থত: একেবারে শিশু বয়স থেকেই তাকে ভদ্রচিত উত্তম আচরণে অভ্যস্ত করে তোলা। এই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল অমাত্য তৈরি করা। অমাত্য ছিল প্রাচীন সামন্ততান্ত্রিক আভিজাত্য ও নব্য সওদাগরতন্ত্রের মিলিত ফসল। অমাত্যের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে ইংরেজ মনীষী ড্যানিয়েল ডুফো বলেছেন যে, অমাত্য হবেন এমন ব্যক্তি যাঁর থাকবে বিদ্যা এবং ভব্যতা উভয়ই। মোটামুটি এই সময়ই মানবতাবাদী শিক্ষার আরেকটি ধারা লক্ষ্য করা যায় যেখানে নৈতিকতার উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মার্টিন লুথার (১৪৮৩-১৫৪৬) বলেছিলেন, সমাজের শৃঙ্খলা ও সংসারের নিয়মনীতির জন্য গুণবান ও সুপ্রশিক্ষিত নারী পুরুষের দরকার।

অপরদিকে, ফ্রান্সিস বেকন (১৫৬১-১৬২৬) ও জোহান এমোস কমেনিয়াস-এর মতে শিক্ষকের দায়িত্ব হল সমগ্র জ্ঞান সম্পদ শিক্ষার্থীর কাছে উপস্থাপন করা অর্থাৎ শিক্ষার্থীর লক্ষ্য হবে এই জ্ঞান আয়ত্ত করা। সমগ্র জ্ঞান অর্জন করা একজন ব্যক্তির পক্ষে প্রায় অসম্ভব এ কথা বুঝতে পেরে জন লক (১৬৩২-১৭০৪) অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে, শিক্ষার কাজ নবীণ শিক্ষার্থীকে কোন একটা বিজ্ঞানে পারদর্শী করে তোলা নয় বরং প্রয়োজনে যাতে সে যে, কোন বিজ্ঞানের জ্ঞান অর্জন করতে পারে তার উপযোগী করে মনকে তৈরি করা। পরবর্তীতে রুশোও বলেছিলেন যে শিক্ষার উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর মনকে জ্ঞান দিয়ে সাজানো নয় বরং যখন প্রয়োজন হবে তখন যাতে সে

জ্ঞান অর্জন করতে পারে তারই পদ্ধতি শেখানো। দার্শনিক লক চরিত্র গঠনকেও শিক্ষার লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করেছিলেন। চরিত্র বলতে তিনি মানুষের সেই ক্ষমতাকে বুঝিয়েছিলেন যার বলে মানুষ নিজেই নিজের কামনা বাসনাকে অগ্রাহ্য করে, নিজের প্রবণতার বিরুদ্ধাচারণ করে কেবল যুক্তির নির্দেশ পালন করতে পারে।

শিক্ষার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে শিক্ষার খুব কম লক্ষ্যই এই লক্ষ্যের মত গুরুত্ব পেয়েছে। এই লক্ষ্যের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য ছিল সামাজিক শৃঙ্খলা নিশ্চিত করা। কিন্তু রুশোর মতে শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত ব্যক্তিতান্ত্রিক। তাঁর মতে সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর উচিত ব্যক্তি শিশুর সহজাত গুণ ও প্রবৃত্তিকে অনুসরণ করা, শিক্ষার্থীকে প্রতিষ্ঠানের আদর্শ অনুযায়ী গঠন করা নয়। পেস্তালৎসী (১৭৪৬-১৮২৭) এবং ফ্রয়েবেল (১৭৮২-১৮৫২) রুশোর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে শিশুর চাহিদা ও ক্ষমতা বিকাশের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। ফ্রয়েবেল চেয়েছিলেন মুক্ত চিন্তাশীল ও স্বনির্ভর মানুষ গড়ে তুলতে। রুশোর মত তিনিও চেয়েছিলেন শিশুর অন্তর সত্তার বিকাশের মাধ্যমে এই লক্ষ্যে পৌঁছাতে। হেগেল (১৭৭০-১৮৩১) আবার এই লক্ষ্যকে বাতিল করে দিয়ে বলেছেন, শিক্ষা ব্যক্তিতান্ত্রিকতার জন্য নয়, এটি হওয়া উচিত বিশ্বজনীনতার জন্য। হারবার্টের (১৭৭৬-১৮৪১) মতে, আদর্শ মানুষ গঠিত হয় বহুমুখী আগ্রহের মধ্যে থেকে নৈতিক উদ্দেশ্য অর্জন ও উন্নয়নকে প্রাধান্য দেয়ার মাধ্যমে। হারবার্ট স্পেন্সারের (১৮২০-১৯০৩) মতে, শিক্ষার লক্ষ্য হবে প্রথমত: আত্ম-সংরক্ষণের কৌশল শেখানো, দ্বিতীয়ত: জীবিকা অর্জনের উপায় শেখানো, তৃতীয়ত: অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সন্তান জন্মদান ও প্রতিপালন সম্পর্কে জ্ঞানদান, চতুর্থত: সামাজিক ও রাজনৈতিক দায়িত্ব পালনের যোগ্য করা এবং পঞ্চমত: মার্জিত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য থেকে আনন্দ লাভের যোগ্য করা।

পাঠ্যক্রম

মধ্যযুগে যদিও মুসলিম বিশ্বের পাঠ্যক্রমে ধর্মশাস্ত্র ছাড়াও ভাষা, সাহিত্য, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত ছিল, আর পাশ্চাত্যের পাঠ্যক্রমে কেবল ধর্মীয়তত্ত্ব এবং নৈতিক শিক্ষারই প্রাধান্য দেখা যায়। রেনেসাঁর সময় থেকে ঈশ্বর কেন্দ্রিকতার পরিবর্তে পাঠ্যক্রম মানব অভিজ্ঞতাকেন্দ্রিক হয়ে উঠতে থাকে। বৌদ্ধিক, শারীরিক, নান্দনিক ও নৈতিক উপাদানে সমৃদ্ধ ভারসাম্যপূর্ণ পাঠ্যক্রমের প্রয়োজনীয়তাও অনুভূত হতে থাকে।

রেনেসাঁকালের মনীষীগণ এরকম আদর্শ শিক্ষার উপাদান খুঁজে পান প্রাচীন গ্রিক ও লাতিন সাহিত্যে। প্রাচীন গ্রিক ও রোমান সংস্কৃতিতে তাঁরা তাঁদের কালের জীবনাচরণের চেয়ে এমন কিছু উন্নত ও প্রাগ্রসর জীবনাদর্শ আবিষ্কার করেছিলেন যে সেগুলো হয়ে উঠেছিল সে কালের রীতিসিদ্ধ আদর্শ। যেহেতু ঐ সব উপাদান বিধৃত ছিল গ্রিক ও লাতিন ভাষায় রচিত পুস্তকসমূহে তাই ঐ ভাষা দু'টি আয়ত্ত করা এবং সাহিত্যের পর্যালোচনা করা ছিল পাঠ্যক্রমের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। এই সাথে বাণিজ্য, গণিত, খেলাধূলা ইত্যাদি বিষয়ও পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। শিল্প ও বিজ্ঞানে গ্রিক ও রোমকদের কাছাকাছি পৌঁছতে ইউরোপীয়দের প্রয়োজন হয়েছিল বেশ কয়েকটি শতাব্দী। তাই বিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্ন পর্যন্ত গ্রিক ও লাতিন ভাষা পাঠ্যক্রমে আধিপত্য বিস্তার করে অবস্থান করেছে। ঐ ভাষাদ্বয়ের মাধ্যমেই ব্যাকরণ, যুক্তিবিদ্যা ও বাগ্মিতা বা অলঙ্কারশাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া হত। এই পাঠ্যক্রমকে Humanities বা মানবতাবাদী পাঠ্যক্রম বলা হয়।

অচিরেই এই পাঠ্যক্রম জীবন বিচ্ছিন্ন, আকার সর্বস্ব ও রুক্ষ হয়ে উঠতে থাকে। কেবল সে সব বিষয়েরই চর্চা হতে থাকে যেগুলো ধৈর্য, অধ্যবসায়, স্মৃতি ও যুক্তিকে শাণিত করতে পারে। এই ধরনের পাঠ্যক্রম অনুসরণকারী বিদ্যালয়গুলোর সঙ্গে সাধারণ মানুষের বিশেষ কোন যোগাযোগ ছিল না। ষোল শতকের দ্বিতীয় দশকেই জার্মানীতে মাতৃভাষা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এখানে সাধারণের জন্য মাতৃভাষা পড়া, লেখা এবং মাতৃভাষার মাধ্যমে ধর্ম শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। পাশাপাশি ধর্মযাজক উচ্চ বিত্তের সন্তান ও উচ্চ শিক্ষার জন্য ক্লাসিকাল

বিদ্যালয়গুলোও চালু থাকে। অন্যত্রও এই ধারা অনুসৃত হতে থাকে। এর ফলেই পরবর্তীতে পাশ্চাত্য দেশগুলোতে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলন ঘটে।

ষোল এবং সতেরো শতকের আগে পর্যন্ত অধিকাংশ পাঠ্যক্রম ছিল মৌখিক ধরনের এবং স্মৃতিনির্ভর। সতেরো শতকে এসে পাঠ্যক্রমকে বাস্তবমুখী করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হওয়ায় ইন্দ্রিয় নির্ভরতা গুরুত্ব পেতে থাকে। ফলে পাঠ্যক্রমে ক্রমশ বিভিন্ন নামে বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্তি ঘটতে থাকে। জ্যোতির্বিদ্যা, বলবিদ্যা বা যন্ত্র নির্মাণবিদ্যা, ভূগোল, প্রাকৃতিক ইতিহাস, অঙ্কনবিদ্যা পাঠ্যক্রমের অঙ্গ হয়ে ওঠে। পাঠ সহায়ক উপকরণ হিসেবে গ্লোব, মাইক্রোস্কোপ, কম্পাস ইত্যাদির আবির্ভাব ঘটে। গণিত যদিও সবসময়ই পাঠ্যক্রমের অংশ ছিল তবু উনিশ শতকের মধ্যেই বৈজ্ঞানিক হিসাব নিকাশের প্রয়োজনে তা পাঠ্যক্রমে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করে। পদার্থবিদ্যা ও রসায়নও পৃথক বিষয় হিসেবে পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হয়। অর্থাৎ পাঠ্যক্রম হয়ে ওঠে বিজ্ঞান নির্ভর।

পাঠদান পদ্ধতি

ষোল শতকের প্রথম দিক থেকেই পাঠদান পদ্ধতিতে কিছুটা পরিবর্তন সূচিত হয়। ইরাসমাস বিষয়বস্তু মুখস্থ করানোর চেয়ে তার উপলব্ধি ঘটানোর উপর জোর দিয়েছিলেন। এরপর থেকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অর্থাৎ আরোহী পদ্ধতিতে জ্ঞানলাভ করার শিক্ষা দেওয়া হতে থাকে। কমেনিয়াসের (১৫৯২-১৬৭০) মতে, শিক্ষার্থী তার ইন্দ্রিয়সমূহ ব্যবহার করে সংবেদন লাভের মাধ্যমে শিখবে। জন লকও (১৬৩২-১৭০৪) পরিবেশে বর্তমান বস্তুসমূহকে ইন্দ্রিয়ের ব্যবহারের মাধ্যমে জানার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। রুশো এবং পেস্তালৎসীও জ্ঞান অর্জনের পদ্ধতি হিসেবে ইন্দ্রিয় ব্যবহারের পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। ফ্রয়েবেল শিশুদের শিক্ষাদানের পদ্ধতি হিসেবে গান গাওয়া, গল্প বলা ও খেলাকে বেছে নিয়েছেন। হার্বার্ট (১৭৭৬-১৮৪১) শ্রেণি শিক্ষণকে নিয়মতান্ত্রিক করার জন্য একটি সোপানভিত্তিক পাঠদান পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। পরবর্তীকালে এটি পঞ্চসোপান পদ্ধতি নামে খ্যাত হয়। স্পেন্সারের (১৮২০-১৯০৩) মতেও শিক্ষাদান পদ্ধতি ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষণ নির্ভর অভিজ্ঞতা ভিত্তিক হবে।

সাম্প্রতিক কাল (১৯০০ সাল থেকে বর্তমান সময়কাল)

শিক্ষার লক্ষ্যের বিবর্তন

বর্তমান শতাব্দীতে আমাদের এই পৃথিবী বস্তুগত অর্জনের মাধ্যমে যত দ্রুত পরিবর্তিত হয়েছে তেমন আর আগে হয়নি। কিন্তু শিক্ষাগত সমস্যাবলি তেমনই রয়ে গেছে যেমন অনুভব করেছিলেন পূর্ববর্তী প্রজন্মের মনীষীগণ। বরং বর্তমান কালের জটিল জীবনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আরো জটিলতর হয়েছে বলা যায়। এই শতাব্দীতে যেমন দেখা গেছে ব্যক্তিতান্ত্রিকতার প্রাধান্য তেমনি সমাজকেন্দ্রিকতারও। ব্যক্তি এবং সামাজিক দলের মিথষ্ক্রিয়াই বর্তমান কালের শিক্ষাতত্ত্বের কেন্দ্রিয় আলোচ্য বিষয়। এ ক্ষেত্রে যাঁর প্রভাব সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হয় তিনি হলে জন ডিউই (১৮৫৯-১৯৫২)। ডিউই ছিলেন প্রয়োগবাদী দার্শনিক। তাঁর মতে শিক্ষার লক্ষ্য নির্ভর করে শিক্ষার্থীর তাৎক্ষণিক পরিবেশ ও পরিস্থিতির উপর। ফলে জীবনের পরিস্থিতি যেমন বহু এবং বিভিন্ন শিক্ষার লক্ষ্যও তেমনি বহু এবং বিভিন্ন। ডিউইর মতে শিক্ষা একটি প্রক্রিয়া এবং এই প্রক্রিয়া শিক্ষার্থীর বুদ্ধির সাথে সংশ্লিষ্ট। বিদ্যালয়ে শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে বুদ্ধি নিশ্চিতকারী শক্তিগুলো সংগঠিত করে শিক্ষাকে নিরবচ্ছিন্ন রাখা। জীবন থেকে শেখার প্রবণতা এবং জীবনের পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে এমনভাবে তৈরি করা যাতে সবাই জীবন যাপন প্রক্রিয়ার মধ্যেই শেখে এগুলোই হচ্ছে বিদ্যালয়ের শিক্ষার বিশুদ্ধ সৃষ্টি। অল্প কথায় বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন, 'শিক্ষা প্রক্রিয়ার কোন অন্য গন্তব্য বা উদ্দেশ্য নেই, এটি নিজেই নিজের গন্তব্য'। অর্থাৎ ডিউইর মতে অবিরাম বিকাশ বা উন্নয়নই হচ্ছে শিক্ষার লক্ষ্য। এই উন্নয়ন ঘটে যখন শিক্ষার্থী সমস্যামূলক পরিস্থিতির সমাধান খুঁজে পায়। সুতরাং শিক্ষার লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় ব্যক্তিকেন্দ্রিক, আপেক্ষিক ও পরিবর্তনশীল। ডিউইর এই দর্শন বিশ

শতকের দ্বিতীয় দশকের দিকে প্রগতিশীল শিক্ষায় শিশু কেন্দ্রিকতাকে লক্ষ্য হিসেবে গুরুত্ব প্রদান নিশ্চিত করেছিল। তবে প্রগতিশীল শিক্ষার ব্যক্তিকেন্দ্রিক লক্ষ্য রচনায় যে কেবল ডিউইর প্রয়োগবাদী দর্শনই অবদান রেখেছে তা নয়। এতে ফ্রয়েডের মনোবিজ্ঞানেরও যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে।

১৯২০ সালের শেষের দিকেই এই লক্ষ্যের বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। হারমান এইচ হরনে এবং অন্যান্যরা শিক্ষার লক্ষ্য হিসেবে অবিরাম বৃদ্ধির ধারণার সমালোচনা করেন। এই বৃদ্ধি ভালও হতে পারে আবার মন্দও হতে পারে। তাই এই অবিরাম বৃদ্ধি প্রক্রিয়া আমাদেরকে কোথায় নিয়ে যাবে সে সম্পর্কে তাঁরা নিশ্চিত হতে চাইলেন। ইতিমধ্যে এ্যারিস্টটেলীয় এবং থমাসীয় শিক্ষা দর্শনের পুনরুত্থান ঘটে এবং যে দিক নির্দেশনার অভাব ছিল প্রগতিশীল দর্শনে তা তারা সরবরাহ করে। এ্যারিস্টটলের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে মর্টিমার জে. এডলার (১৯০২) দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেন যে শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে নৈতিক ও বৌদ্ধিক সদগুণের মাধ্যমে সুখ সন্ধান করা। শুধু তাই নয়, তিনি বিশ্বাস করতেন যে, "শিক্ষার লক্ষ্য সবার জন্য একই হবে (অর্থাৎ সর্বত্র, সর্বদা, সমাজের প্রতিধারায়, জীবনের প্রতিক্ষেত্রে)"। এসব বক্তব্যের প্রভাবে ডিউই প্রগতিশীল দর্শনের মত অর্থাৎ অনির্দেশিত ও অপ্রতিহত আত্মবিকাশের ধারণা প্রত্যাখ্যান করেন এবং শিশুর বিকাশমান সম্ভাবনায় পরিণত বয়স্কদের সহায়তা দানের প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারটি তুলে ধরেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি চেয়েছিলেন যে, ব্যক্তির লক্ষ্য, শিল্প ও রাজনীতিতে সামাজিক দক্ষতার চাহিদা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। এভাবেই ডিউইর শিক্ষাদর্শন ব্যক্তির চাহিদা ও সমাজের চাহিদা দু'টোকেই সমান গুরুত্ব দেয়। বিশ শতকের প্রায় পুরোটা জুড়েই শিক্ষাঙ্গনের কর্মকাণ্ডে ডিউইর প্রভাব উল্লেখযোগ্য পরিমাণে দেখা যায়। ডিউইকেই বোধ হয় কালজয়ী প্রকৃতির শিক্ষা দার্শনিকদের মধ্যে শেষ ব্যক্তিত্ব বলা চলে।

বিশ শতকের আরেকজন প্রভাবশালী দার্শনিক হলেন অলফ্রেড নর্থ হোয়াইটহেড (১৮৬১-১৯৪৭)। তাঁর মতে শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত এমন মানুষ তৈরি করা যাঁরা হবেন সংস্কৃতিবান এবং যাঁদের থাকবে কোন না কোন ক্ষেত্রে বিশেষ জ্ঞান। এই বিশেষ জ্ঞান তাঁদেরকে দেবে চলা শুরু করার ভিত্তি এবং সংস্কৃতি তাদেরকে নিয়ে যাবে দর্শনের মত গভীরে ও কলার মত উচ্চমার্গে। সংস্কৃতি বলতে তিনি বুঝিয়েছেন চিন্তার সক্রিয়তাকে এবং সৌন্দর্য ও মানবীয় অনুভূতির গ্রহীতাকে। তিনি বলেছেন সভ্যতার উষালগ্ন থেকে প্রতি যুগে যে মূল শিক্ষাদর্শ আমাদের মাঝে বিরাজমান ছিল আমরা তার কর্মে সন্তুষ্ট হতে পারি না। শিক্ষার সেই সারটি হল ধর্মীয় হওয়া। ধর্মীয় শিক্ষা বলতে তিনি বুঝিয়েছেন সেই শিক্ষাকে যে শিক্ষা কর্তব্যবোধ ও গভীর শ্রদ্ধাবোধ শিক্ষার্থীর হৃদয়ে গ্রোথিত করে। সুতরাং তাঁর মতে শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত শিক্ষার্থীর মধ্যে চিন্তার সক্রিয়তা, সৌন্দর্য ও মানবীয় অনুভূতির গ্রহিতা, কর্তব্যবোধ ও শ্রদ্ধাবোধকে জাগ্রত করা ও সেই সাথে জ্ঞানের বিশেষ ক্ষেত্রে পারদর্শী করে তোলা।

সাম্প্রতিককালের স্বনামধন্য দার্শনিক হলেন বার্ট্রান্ড রাসেল (১৮৭২-১৯৭০)। তাঁর মতে ছাত্রদের কল্যাণই শিক্ষার চরম লক্ষ্য হওয়া উচিত। ছাত্রকে অন্য কোন উদ্দেশ্য সাধনের উপায়রূপে ব্যবহার শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়। তিনি বলেছেন স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের মধ্যে কতকগুলো গুণের সমাবেশ ঘটলে তারা আদর্শ চরিত্রের অধিকারী হয়ে উঠতে পারে। মোটামুটিভাবে সেগুলো হল উদ্যম, সাহস, অনুভূতিশীলতা এবং বুদ্ধি। ভারতীয় শিক্ষা দার্শনিকদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) বিশিষ্টতার দাবীদার। তাঁর মতে 'সর্বাঙ্গীন মনুষ্যত্বের ভিত্তি স্থাপন' হচ্ছে শিক্ষার লক্ষ্য। তিনি বলেছেন, "আমরা মানুষ বলতে যা বুঝি আমাদের শিক্ষাও অনুরূপ আদর্শসম্পন্ন হবে। কারণ মানুষ করে তোলাই শিক্ষা"। তাঁর মতে এই মনুষ্যত্বের শিক্ষার দুটি অংশ আছে, (১) কৃতিত্ব শিক্ষা, (২) সংস্কৃতি শিক্ষা। কৃতিত্ব শিক্ষা কর্মের শিক্ষা। এই শিক্ষা শিক্ষার্থীর চরিত্রকে বলিষ্ঠ ও কর্মঠ করে, সব অবস্থার জন্য তাকে নিপুণভাবে প্রস্তুত করে, নিরলস আত্মশক্তির উপর নির্ভর করে কর্মানুষ্ঠানের দায়িত্ব সাধনের যোগ্য করে। আর সংস্কৃতি শিক্ষা হলো 'সমগ্র মানুষের চিত্তবৃত্তিকে গভীরতর স্তর থেকে সম্মান করতে পারার শিক্ষা'। এই শিক্ষা মানুষকে জড়ভাবে প্রথা পালনের চেয়ে অকৃত্রিম সৌজন্যকে বড়ো মূল্য দেয়ার যোগ্য করে।

পাঠ্যক্রম

বিংশ শতাব্দীর পাঠ্যক্রম রচনায় প্রয়োগবাদী প্রভাব প্রণিধানযোগ্য। এই প্রভাব বিশেষভাবে ডিউইর কর্মতৎপরতার ফসল। প্রয়োগবাদ উপযোগিতা ভিত্তিক মতবাদ। ডিউইর মতে পাঠ্যক্রম রচনায় উপযোগিতার নির্ধারক হবে শিক্ষার্থী নিজে। সতত পরিবর্তনশীল সমাজ পরিবেশে শিক্ষার্থী নিত্য নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করে। এই অভিজ্ঞতাসমূহের মধ্যে থেকে তার আগ্রহ অনুযায়ি পাঠ্যক্রম রচিত হতে থাকবে। তবে কেবল আগ্রহ জাগার জন্য অপেক্ষা না করে আগ্রহ জাগানোর ব্যাপারেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কারণ মানবজাতির জ্ঞানমূলক বৌদ্ধিক সঞ্চয়ন যদিও শিক্ষার্থীর তাৎক্ষণিক পরিবেশের বিষয় নয় তবু বর্তমান অভিজ্ঞতার ভিত্তি হিসেবে সেগুলোর উপযোগিতা থাকায় সেগুলোর প্রতি শিক্ষার্থীকে আগ্রহী করে তোলা দরকার। তাই বিংশ শতাব্দীর পাঠ্যক্রমে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়সমূহের সাথে সাথে সাহিত্য, বিজ্ঞান, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, সঙ্গীত, কাব্য, চারুকলা ইত্যাদিও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তবে এই শতাব্দীর পাঠ্যক্রমের বৈশিষ্ট্য এই সমস্ত বিষয়গুলি কেবল তত্ত্বীয়ভাবে নয় বরং সক্রিয়তা ও সমাজ সম্পৃক্ততার মাধ্যমে শিক্ষাদান করা।

পাঠদান পদ্ধতি

বর্তমান শতাব্দীকে জন ডিউইর আরেকটি উল্লেখযোগ্য উপহার হল সমস্যা পদ্ধতি। ডিউইর মতে প্রকৃত শিখন ঘটে কোন কাজ করতে গিয়ে সমস্যার সম্মুখীন হয়ে তার সমাধান খুঁজে পাবার মাধ্যমে। তাঁর মতে শিক্ষাদানের কার্যকর পদ্ধতি হচ্ছে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাছে প্রশ্নের আকারে কোন একটা সমস্যাকে সমাধানের জন্য উপস্থাপন করবেন। সঠিক ভাবে উপস্থাপন করতে পারলে শিক্ষার্থীরা সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসবে এবং সমাধানের চেষ্টা করবে। এই পদ্ধতি যথার্থই বাস্তবতা ও সক্রিয়তা ভিত্তিক। পরবর্তীতে এই পদ্ধতির একটি উন্নততর সংস্করণ উদ্ভাবন করেন ডিউইর শিষ্য উইলিয়াম হার্ড কিলপ্যাট্রিক। এই পদ্ধতিকে কাজের মাধ্যমে শিক্ষাদানের ও শিক্ষালাভের সবচেয়ে ভাল পদ্ধতি বলা হয়ে থাকে। কিলপ্যাট্রিকের মতে সর্বান্তকরণে উদ্দেশ্যমূলকভাবে প্রকৃত সামাজিক পরিবেশে শিক্ষাদান ও গ্রহণে অগ্রসর হওয়ার প্রক্রিয়াকে প্রকল্প পদ্ধতি বলা যায়। এরপর এইচ সি মরিসন উদ্ভাবন করেন ইউনিট প্ল্যান পদ্ধতি। এটি সমস্যা পদ্ধতি ও প্রজেক্ট পদ্ধতির মিশ্রণে সৃষ্ট এবং শ্রেণিকক্ষে ব্যবহারের উপযোগী। মরিসনের মতে পূর্ব পরীক্ষা, পাঠদান, ফলাফল যাচাই, প্রণালী বাছাই, পাঠদান এবং আবার পরীক্ষা এভাবেই প্রকৃত শিখন ঘটানো সম্ভব। ব্যক্তি বৈষম্যের কারণে অনেক সময় শ্রেণি শিক্ষণ অকার্যকর বলে বিবেচিত হয়। এই অসুবিধা দূর করার জন্য অবেক্ষণ পাঠচর্চার উদ্ভাবন করা হয়। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা নিজেদের গতি অনুযায়ি নিজেরাই কোন বিষয় পাঠ করে এবং শিক্ষক ঘুরে ঘুরে তাদেরকে সাহায্য করেন। এই শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে আর্মস্ট্রং বিজ্ঞান শিক্ষাদানের জন্য একটি পদ্ধতির প্রচলন করেন। তাকে বলা হয় আবিষ্কার পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা নিজে নিজে পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সিদ্ধান্তে উপনীত হবে; শিক্ষক কেবল প্রয়োজনে নির্দেশনা দেবেন। এই শতকেরই দ্বিতীয়ার্ধে উদ্ভাবিদ হয় স্বশিখনের আরেকটি পদ্ধতি যার নাম প্রোগ্রাম শিখন। এই পদ্ধতিতে শিখনীয় বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীর প্রয়োজন ও গ্রহণ ক্ষমতা অনুসারে বিভক্ত করে আনুক্রমিক সম্পর্কযুক্ত ছোট ছোট অংশে যন্ত্র অথবা বইয়ের মাধ্যমে পরিবেশন করা হয়। বিষয়াংশের শেষে প্রশ্ন থাকে। প্রশ্নের উত্তর ঠিক হল কিনা তাও শিক্ষার্থীরা সঙ্গে সঙ্গে জানতে পারে এবং না হলে বিষয়বস্তুর পুনরাবৃত্তি করতে পারে। উত্তর সঠিক হলে সফলতার আনন্দ লাভ করে পরবর্তী ধাপে যাওয়ার আগ্রহ শিক্ষার্থী নিজে থেকেই অনুভব করে। বর্তমান শতাব্দীতে সঞ্চিত ব্যাপক সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার অধিক মানুষের মধ্যে দ্রুত ছড়িয়ে দেয়ার জন্য নিত্যনতুন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েই চলেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৫

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. আজকের যে বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থা তা কিসের ফল?
   ক. দীর্ঘ গবেষণার ফল
   খ. হাজার বছরের বির্বতনের ফল
   গ. আড়াই হাজার বছরের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের ফল
   ঘ. আদিম কালের আধুনিকীকরণ

২. গোষ্ঠী জীবনের ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজন কোনটি?
   ক. গোষ্ঠীগত রীতি-নীতির অনুসরণ
   খ. গোষ্ঠীগত রীতি-নীতির সংরক্ষণ ও স্থায়ীকরণ
   গ. গোষ্ঠী জীবনের উন্নয়ন
   ঘ. সবকটিই

৩. কোন সময়ের শিক্ষা ব্যবস্থায় কোন শিক্ষাক্রম বা পাঠ্যসূচি ছিল না?
   ক. প্রাচীনকালে
   খ. আধুনিককালে
   গ. সাম্প্রতিককালে
   ঘ. আদিমকাল

উত্তরমালা: ১. গ, ২. গ, ৩. ক

খ. সংক্ষিপ্তমূলক প্রশ্ন

১. প্রাচীনকালে পাঠদান পদ্ধতি কেমন ছিল?
২. আধুনিক কালের পাঠদান পদ্ধতি বলতে কী বুঝায়?
৩. সাম্প্রতিক কালে শিক্ষার লক্ষ্য কী?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. শিক্ষা দর্শনের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশকে কয়টি ভাগে ভাগ করা যায়? সংক্ষেপে সেগুলো বর্ণনা করুন।
২. প্রাচীনকালের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করুন।
৩. আধুনিককালের শিক্ষা বিজ্ঞানীদের অভিমত বিশ্লেষণ করুন। এ সময়ের পাঠদান পদ্ধতি ও পাঠ্যক্রম কেমন ছিল?
৪. সাম্প্রতিককালের শিক্ষার লক্ষ্য বর্ণনা করুন।